সংবাদ

তারিখ ... 07 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪ ...

সাক্ষরতা এবং স্থায়ী উন্নয়ন

আ.ন.স হাবীবুর রহমান

উন্নয়ন শব্দের সঙ্গে টেকসই বা স্থায়িত্বশীল শব্দ যোগ করা হচ্ছে গত তিন-চার দশক যাবৎ। এর আগে উন্নয়ন সংজ্ঞায়নে আলাদা বিশেষণের প্রয়োজন হতো না। কিন্তু সুদূর অতীতে এমন সব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমরা যুক্ত হয়ে পড়েছিলাম যেগুলো পরবর্তীতে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তাঘাট বা দালান-কোঠা তৈরি করতে গিয়ে আমরা পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রাখিনি। কলকারখানা গড়তে গিয়ে পরিবেশ ধ্বংস করেছি। আমরা ভোগবাদিতা যত বাড়িয়েছি পরিবেশের ততই বিপর্যয় ঘটেছে। আজ বিশ্বে উষ্ণায়ন নিয়ে অনেক শংকা। আর এর জন্য বেশিরভাগ দায়ী উন্নত দেশগুলো। উন্নয়ন সম্প্রসারণে নিয়োজিত কর্মীরা ষাট বা সত্তরের দশকে কৃষকের কাছে গিয়ে রাসায়নিক সারের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। আর তাদের উত্তরসূরিদের গিয়ে রাসায়নিক সার ব্যবহারের অপকারিতা বোঝাতে হচ্ছে। কলেরা, ডায়রিয়া থেকে বাঁচার জন্য নলকূপের পানি পান করার যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে আর্সেনিকমুক্ত পানি পানের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। পরিবেশের এসব বিষয় ছাড়াও আরো অনেক কিছুই আছে যা আমরা বিশেষভাবে বিবেচনায় নিতাম না। ধরা যাক কৃষির উন্নয়ন বা উপরি-কাঠামোর উন্নয়ন। এজন্য অনেক কাজ করা হলো, তারপর দেখা গেল কৃষির ঢের উন্নয়ন হলেও প্রান্তিক কৃষকের অনেকেই ভূমিহীন কিংবা দিনমজুরে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা পিছিয়ে গেছে। প্রতিবন্ধীদের কথা মনে না রেখে উন্নয়ন করার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা আরো সমস্যা সংকুল হচ্ছে। এমনিভাবে অনেক কিছুই আপাত উন্নয়ন হলেও এক সময় অনেকের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে– এ ভাবনা থেকেই স্থায়িত্বশীল শব্দটি উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ?

উন্নয়নের জন্যই সাক্ষরতা। সাক্ষরতা ব্যক্তির মানবিক উন্নয়ন ঘটায় যা ব্যবহার করে সে নিজের উন্নয়ন সাধন করে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মুষ্টিমেয় লোক যখন শিক্ষার সুযোগ পায় তাদের অনেকে এটিকেও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এজন্য দেখা যায়, অনেক শিক্ষিত লোক চারপাশের মানুষের সম্পদ কুক্ষিগত করে বড়লোক হচ্ছে। নিরক্ষর লোকেরা এটাকে ভাগ্যের লিখন হিসেবে মেনে নিচ্ছে। সমাজে এরকমভাবে বড়লোক হওয়াকে নানাভাবে সঙ্গত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এর বিপরীতে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতার কথা বলা হচ্ছে। এতে ব্যক্তি যখন উন্নত হয় চারপাশের মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়। দীর্ঘ মেয়াদে এর থেকে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা থাকে না। অর্থাৎ স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে পরিবেশ এবং প্রতিবেশের সবকিছুই নিরাপদ থাকে। সাক্ষরতাকে এরকম লক্ষ্যের সাথে মিলিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। আবার দরিদ্র নিরক্ষর মানুষের উন্নয়নের অনেক অন্তরায় থাকে। তাদের মধ্যে বিভেদ, কুসংস্কার, অদৃষ্টবাদিতা, বৈষম্যবোধসহ এমন অনেককিছু আছে যা একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কিত। এগুলো মানুষের মধ্য থেকে দূর করতে না পারলে উন্নয়ন হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। যেমন একজন নারী ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা নিয়ে ব্যবসা করে অনেকটা সচ্ছলতার মুখ দেখলেন। কিন্তু তার মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিতে গিয়ে তিনি মহাজনী ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে আবারও পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলেন। এটা স্বাস্থ্য বিষয়ে অজ্ঞতার কারণেও হতে পারে। শিশুর ডায়রিয়ায় কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা না নেয়ায় এমন অবস্থা হতে পারে যে তার জন্য হাজার টাকাও ব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে একটি গ্রামের মানুষের মধ্যে অনৈক্যের কারণে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে বেশিরভাগ নিঃস্ব হতে পারে। উন্নয়নের এসব অন্তরায়কে মাথায় রেখেই সাক্ষরতার পরিকল্পনা করতে হবে। সাক্ষরতা যেন উন্নয়ন সাধন করে, এটিকে ধরে রাখে এবং উন্নয়নের সকল অন্তরায়কে চিহ্নিত করে তা থেকে পরিত্রাণে তৎপর থাকে।

দেশে সাক্ষরতার বিস্তার প্রধানত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। রাষ্ট্র সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করছে। বর্তমান শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত হতে যাচ্ছে। এখানে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি দেখতে হলে মানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ স্তর উত্তরণের সাথেসাথে যেন শিশু সমাজকে কিছু দিতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারী শিশু নৈতিকতা অনুসরণ করবে, নিজে যেমনটি বলতে চায় অন্যকে তেমনটি বলার অধিকার দেবে, পরধর্মের প্রতি সহনশীল হবে, দেশকে অকৃত্রিম ভালোবাসবে, দলীয় কোন্দলে লিপ্ত হবে না, সন্ত্রাসও মাদক থেকে দূরে থাকবে, ছেলেমেয়ের সমতায় বিশ্বাসী হবে, প্রতিবন্ধীদের প্রতি দায়িত্বশীল হবে, পরিবেশ রক্ষায় সচেষ্ট হবে, শ্রমজীবীকে সম্মান দেখাবে। শিক্ষার মধ্যে এসব কিছুর প্রতিফলন থাকলেই কেবল এসব গুণাবলি দ্বারা শিশু সমৃদ্ধ হতে পারে। দেশে নিরক্ষর কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনার সময়ও এসব মানবিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা এবং অন্যান্য সাক্ষরতা কোর্সে মানবিক গুণাবলি সঞ্চারণের জন্য এসবের যথাযথ অনুশীলন করাতে হবে। শিক্ষা যদি এ গুণাবলিকে দৃঢ়ভাবে গ্রোথিত করতে পারে তা হলে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং স্থায়িত্বশীল হতে বাধ্য।

বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাটি সুপ্রাচীন। সরকারি এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রচেষ্টায় কিশোর কিশোরী এবং বয়স্ক নারী পুরুষ এ ধারায় সাক্ষরতা লাভ করছেন। শুরুর দিকে এটি কেবল লেখাপড়ার জন্য পরিচালিত হলেও বিগত তিন দশক যাবৎ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে জীবন দক্ষতা এবং জীবিকা দক্ষতা উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এ দুটোই স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। অংশগ্রহণকারীগণ জীবন দক্ষতার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছেন, সংগঠন তৈরি করছেন, ন্যায্যতার জন্য সোচ্চার হচ্ছেন, যৌতুক, নারী-শিশু নির্যাতন ও সামাজিক অনাচারসহ শোষণ নির্যাতনের সকল বিষয়ে প্রতিবাদী হচ্ছেন। জীবন দক্ষতাই তাদেরকে নেশা থেকে দূরে রাখছে। আবার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অনেকেই জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এসব জীবিকা দক্ষতা দরিদ্র মানুষের আয়ের স্তরকে উন্নীত করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ভুক্ত দেশ থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এর মূলে কাজ করেছে দরিদ্র মানুষের জীবিকা দক্ষতার উন্নয়ন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

দেশে স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তৃণমূলে এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন যেটি মানুষের শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের দিকটি নিশ্চিত করবে। এটি শুধু শিশুদের জন্য নয়, কিশোর-কিশোরী এবং বয়স্কদের জন্যও অপরিহার্য। নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য সাক্ষরতা, সীমিত লেখাপড়া জানা মানুষের জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ, সবার জন্য আয়বর্ধনমূলক দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্র তৈরিতে এরকম প্রতিষ্ঠান অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসহ বিশ্বের অনেক দেশে এগুলো কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার বা সিএলসি নামে পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের দেশেও জনশিক্ষন কেন্দ্র বা গণকেন্দ্র নামে সীমিতসংখ্যায় এরকম প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এটিকে বিস্তৃত করতে হবে। ওয়ার্ড ভিত্তিতে এরকম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। স্থানীয় জনসমাজই এরকম প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবেন। এর জন্য স্থানীয়ভাবেই সম্পদ আহরণ করতে হবে। আমাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এরকম প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর পরিচালনা পরিবীক্ষণ করতে পারে। এছাড়া এনজিও এবং সুশীল সমাজ সংগঠন এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার কর্মপরিধিকে অনেক ব্যাপক করতে পারে।

বাংলাদেশ প্রযুক্তি ব্যবহারে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। প্রযুক্তির ব্যবহার গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। সরকারি প্রচেষ্টায় ইউনিয়ন পরিষেবা বাড়ানোর জন্য তথ্যসেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য ক্লিনিক স্থাপিত হয়েছে। ঘরে ঘরে মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে। এসবকে সমৃদ্ধি করে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা পেলে বাংলাদেশের মানুষ প্রতিনিয়তই তাদের আরও শিক্ষিত, আরও দক্ষ করার সুযোগ পাবে। এবারকার ৮ সেপ্টেম্বর সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে সাক্ষরতার মাধ্যমে টেকসই সমাজ গঠন। বাংলাদেশ কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার বা সিএলসি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়নের সকল পদক্ষেপকে সমন্বয় করে এমন একটি টেকসই সমাজ গঠনে অনায়াসে এগিয়ে যেতে পারে।

লেখক : সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ
E.mail: ans habib@yahoo.com